মৎস্য ও প্রাণীপালন

বাংলার মৎস্য ও প্রাণীপালক বন্ধুদেরকে উৎসাহিত করতে
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের
গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণের গ্রামীণ পত্রিকা

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর, ২০১৬ | আশ্বিন, ১৪২৩

উপাচার্য্যের বার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ থেকে ''মৎস্য ও প্রাণী পালন'' নামক একটি 'ফার্ম জার্নাল' প্রকাশিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের খামারী বন্ধুদের কাছে এই পত্রিকা একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। গবেষণাগার থেকে উৎভূত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা এক অর্থবহ ভূমিকা বহন করবে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মৎস্য ও প্রাণী পালনের গুরুত্বও অপরিসীম। মৎস্য ও প্রাণীপালন আজ শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে যা গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতিকে বলশালী করেছে। একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, বেকার সমস্যা ও কৃষক প্রতি চাষযোগ্য জমির অপ্রতুলতা, এই অবস্থায় মৎস্য ও প্রাণীপালন গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সাথে রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদকে শক্তিশালী করবে। আর এই কর্মকান্ডে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তার ভূমিকা নিরলসভাবে করে চলেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা রাজ্যের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ ও দৌহ বিজ্ঞানের উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের গ্রহণযোগ্য করতে অগ্রণী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৃষ্ট উন্নত মানব সম্পদ আজ রাজ্যের তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। রাজ্যের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা, আধুনিক শিক্ষা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানের সার্থক সম্প্রসারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল অগ্রাধিকার। এই পত্রিকার প্রকাশনা রাজ্যের কৃষকের কাছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের দৃঢ় মাধ্যম।

নব্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে ''মৎস্য ও প্রাণীপালন'' তার যোগ্য ছাপ রাখতে পারবে বলে আমি আশা রাখি। এই পত্রিকা প্রকাশে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ''মৎস্য ও প্রাণীপালন'' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস

দশম সমাবর্তন

শতাব্দী দাস ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১৭ই মার্চ, ২০১৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলগাছিয়া ক্যাম্পাসে। সমাবর্তনের উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন মাননীয় রাজ্যপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পদ্মবিভূষণ অধ্যাপক (ড.) রামবদন সিং, আচার্য ইম্ফল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই সমাবর্তনে D.Sc (Honourary Causa) সম্মানে ভূষিত হন অধ্যাপক দীপেন্দ্র নাথ মৈত্র এবং অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী, প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রি পান ৯৭ জন, ৬৪ জন পান মাস্টার ডিগ্রি এবং ১৮জন পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি পান।

মাননীয় আচার্য তাঁর ভাষণে ডিগ্রিপ্রাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে উন্নত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে ডিগ্রিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন ১৯৬০ এর দশকে ভারতে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটেছিল। এরপরে আসে সাদা, হলুদ ও নীল বিপ্লব। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনে ভারতবর্ষে খুবই উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। খাদ্যশস্য ২৬৭ মিলিয়ন টন, ফল ও শাকসব্জি ২৮১ মিলিয়ন টন, দুধ ১৪৬ মিলিয়ন টন এবং মাছ ১১ মিলিয়ন টন - এই হল বর্তমানে ভারতে উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ। এই 'রামধনু' বিপ্লবের ফলে দারিদ্র ও ক্ষুধার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর ৪০% অপুষ্ট শিশু আমাদের দেশেরই সন্তান। সুতরাং দেশের শিশুদের পুষ্টিসাধন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

দশম সমাবর্তনে ডি. এস. সি প্রদান করা হচ্ছে অধ্যাপক ডি. এন মৈত্রকে।

বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রকল্পগুলি চলছে তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় পশ্চিম মেদিনীপুরে আদিবাসী মানুষদের মধ্যে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুন্দরবন ও অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিশ্ববিদ্যালয় তার গবেষণার ফসল পৌঁছে দিচ্ছে বলে জানান উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। মাননীয় উপাচার্য্য আরও জানান যে, মাছের অসুখ ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য গবেষণা করছে। এ বছরের ২১শে জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যের দ্বিতীয় ভেটেরিনারি ও ফিশারী কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন জলপাইগুড়ি জেলার রামশাইর পানবাড়িতে। বর্তমানে মেক-ইন-ইন্ডিয়া, স্টার্ট-আপ-ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়ার সঙ্গে কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষাকে চাকরি ও স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্থানীয় ও জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে দেশের জ্ঞানভান্ডার গড়ে তোলা দরকার। এবং সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব অপরিসীম। ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন তারাই পারবে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব করে প্রযুক্তির জগতে বিপ্লব ঘটাতে।

রামশাইতে নতুন প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান কলেজ

কেশব ধারা ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি নতুন প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান কলেজ সত্ত্বর চালু হতে চলেছে। রাজ্যে ১২২ বছর আগে সৃষ্ট ভেটেরিনারী কলেজ ''বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ'' এর পর উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার পানবাড়ি মৌজায় আবার একটি ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন রাজ্যের উন্নয়নের এক যুগান্তকারী মাইল ফলক। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১শে জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে ''কলেজ অফ্ অ্যানিমাল এন্ড ফিসারী সাইন্স'' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন এটি রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকারের উত্তরবঙ্গের মানুষের চাহিদা পূরণের একটি সাধু প্রচেষ্টা। স্বাধীন ভারতে রাজ্যে এই ধরনের কলেজ স্থাপন রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর একটি অংশ। এই কলেজ উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে তিনি আশা করেন। এই কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরে প্রস্তাবিত ভেটেরিনারী ও ফিসারী কলেজের জায়গা পরিদর্শনে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, বিভাগীয় সচিব শ্রী রাজেশ সিন্‌হা, রাজ্যের প্রাণীসম্পদ ও প্রাণী চিকিৎসা অধিকর্তা, স্থানীয় বিধায়ক শ্রী অনন্তদেব অধিকারী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করে সকলেই তাঁদের সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। মাননীয় উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস জানান যে ২০১৮ সালের মধ্যেই কলেজের পঠনপাঠন চালু করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট হবে। কলেজটি স্থাপনে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার এই কলেজটি স্থাপনের জন্য ২৫৩ কোটি টাকা রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে এবং কলেজ তৈরীর জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো সত্ত্বর তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধক অধ্যাপক আশীষ সামন্ত।

প্রস্তাবিত ভেটেরিনারী ও ফিসারী কলেজের স্থান পরিদর্শন করছেন মাননীয় উপাচার্য্য, বিভাগীয় সচিব, স্থানীয় বিধায়কসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষী ভাইদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণালব্ধ ফলগুলিকে পৌঁছে দেওয়া। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ বিভাগ। এই বিভাগ থেকেই তাই প্রকাশিত হতে চলেছে এই 'খামার পত্রিকা' মৎস্য ও প্রাণীপালন যা খামারী ভাইদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি পত্রিকা বলে পরিগণিত হবে বলে আশা রাখি। এতে থাকছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিস্তৃত কর্মকান্ডের কিছু সংক্ষিপ্ত বার্তা, ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কাজকর্ম ও সাফল্যের কথা, শিক্ষক ও গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের বিবরণ এবং ঐসব প্রযুক্তির ব্যবহারে কিভাবে স্বনির্ভর ও সফল হয়েছেন সাধারণ খামারী ভাই-বোনেরা, তার অত্যন্ত আকর্ষনীয় কিন্তু কাহিনী, যা কাহিনী হলেও সত্য। সঙ্গে থাকছে অতি মূল্যবান রঙিন ফোটোগ্রাফ।

আশাকরি, সারা বাংলার প্রাণীপালক ও মৎস্যচাষী ভাই-বোনেদের কাছে এই পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং তাদের সফলতার পিছনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ কামনা করি।

ভেটেরিনারী ফার্মাসিতে ডিপ্লোমা চালু হল বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভেটেরিনারী ফার্মাসি'র উপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু হতে চলেছে মোহনপুরে। অতীতে এই কোর্সটি রাজ্যসরকারের প্রাণীপালন ও প্রাণীচিকিৎসা অধিকরণের অন্তর্গত ছিল, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়টি পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট পাঠক্রম তৈরী করার সাথে সাথে উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করেছে। উচ্চমাধ্যমিকে রসায়ন, ভৌতবিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান বিষয়টি নিয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রীরাই এই কোর্সে পঠন পাঠনের আবেদন করতে পারবেন এবং উচ্চমাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তৈরী মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি হবে। বর্তমানে এই ডিপ্লোমা কোর্সে সীট্ সংখ্যা ৩০। সমগ্র ভর্ত্তি প্রক্রিয়াটি 'অন্‌লাইন' পদ্ধতি মাধ্যমে করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক জানান।

''দুগ্ধ শিল্পে খাদ্য সুরক্ষা আইন'' শীর্ষক আলোচনা - অনুষ্ঠিত হল ডেয়ারী ফ্যাকাল্টিতে

অপরাজিতা বিশ্বাস ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুগ্ধ প্রযুক্তি অনুষদে গত ১৭ই অক্টোবর ২০১৫তে 'দুগ্ধ শিল্পে খাদ্য সুরক্ষা আইন' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কিত করেন মাননীয় বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শ্রী পরশ দত্ত। প্রাক্তন উপাচার্য্য তথা IDA এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারম্যান অধ্যাপক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক অসিত চক্রবর্তী, দুগ্ধ প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক তরুন মাইতি সহ অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির সভাপতি ডঃ অসিতাভ সুর সকল অভ্যাগতদের স্বাগত জানান। দুগ্ধ শিল্পের সম্ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা বক্তাদের বক্তব্য থেকে উঠে আসে। চাহিদা থেকে যোগান কম থাকার কারণে অধিক দুধ উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাধান্যের বিষয় বলে জানান শ্রী পরশ দত্ত। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধ উপজাত দ্রব্য তৈরীতে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান অধ্যাপক পুর্ণেন্দু বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রায় দুইশতাধিক প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা চক্রে পাশাপাশি দুগ্ধপ্রযুক্তি অনুষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ১৩তম পুনর্মিলন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্যে প্রথম সরকারী ইন্‌ডোর পেট ক্লিনিক চালু হল পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিকাশকান্তি বিশ্বাস ঃ পোষ্য প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য রাজ্যে প্রথম সরকারী ইনডোর চিকিৎসা কেন্দ্রের শুভসূচনা হল গত ১৯শে জুলাই ২০১৬ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলগাছিয়া ক্যাম্পাসে। এই পেট ক্লিনিকটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্টমন্ত্রী মাননীয় শ্রী স্বপন দেবনাথ। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা তথা বিশ্ববিদ্যালয় Executive Council সদস্য মাননীয়া শ্রীমতি মালা সাহা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব শ্রী রাজেশ সিন্‌হা, কোলকাতা পুরসভার ১নং বরোর চেয়ারম্যান শ্রী তরুণ সাহা ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় উপাচার্য্য অধ্যাপকপূর্ণেন্দু বিশ্বাস। রাজ্যের মানুষ তাঁদের পোষ্য প্রাণীর চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের চিকিৎসার কারণে ভর্তি করে এই ইন্‌ডোর ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারবেন। সরকারী উদ্যোগে এই ধরনের ব্যবস্থা রাজ্যে প্রথম যা রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচীর একটি অংশ। শতাব্দী প্রাচীন ডগ ওয়ার্ডের এই সম্প্রসারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

ঐ একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলগাছিয়া ক্যাম্পাসে মৃত পোষ্য প্রাণীর সমাধিক্ষেত্রের (বারিয়াল গ্রাউন্ড) এর উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী। মৃত পোষ্য প্রাণীর এই ধরনের সমাধিক্ষেত্র রাজ্যের প্রথম যা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের অংশ।

ইন্‌ডোর পেট ক্লিনিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

পোষ্য প্রাণীর সমাধিক্ষেত্রের উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী।

মৎস্য হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতবর্ষের প্রথম মৎস্য হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের কলকাতা শহরে, আগামী ২-৩ মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হবে সেখানে। আমাদের রাজ্যের মৎস্যচাষের সঙ্গে যুক্ত বহুসংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন এই হাসপাতালটি থেকে, কারণ মাছের রোগ নির্ধারণ ও নিরাময়ের ব্যবস্থা থাকবে এই হাসপাতালে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এর ফলে এ রাজ্যে মাছের উৎপাদন আরও বাড়বে। অধ্যাপক টি. জে. আব্রাহাম, যিনি এই প্রকল্পের প্রধান এবং অ্যাকোয়াটিক অ্যানিম্যাল হেলথ বিভাগের অধ্যাপক, তাঁর কথায় ''পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ, বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ চলছে। আমাদের উদ্দেশ্য এ রাজ্যের মাছের মধ্যে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় সেগুলি চিহ্নিত করে নির্মূল করে মাছের উৎপাদন বাড়াতে মাছচাষীদের সাহায্য করা। পশ্চিমবঙ্গ মাছ উৎপাদনে দেশের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি রাজ্য, সুতরাং এই হাসপাতাল অত্যন্ত জরুরী।''

হাসপাতালটিতে বর্তমানে ৫০টি কাচের অ্যাকোয়ারিয়াম এবং ২৫টি গোলাকার জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে মাছের চিকিৎসার জন্য। এর জন্য ১.৭৫ কোটি টাকা অনুদান পাওয়া গেছে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের অধীন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ থেকে। ভারতের প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থা (ZSI) একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে মাছের শরীরে, তাদের অন্ত্রে বিভিন্নরকম পরজীবি বাস করে, যাদের দ্বারা এরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলে ডিম পাড়ার ক্ষমতা কমে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মতে রাজ্যের উৎপাদিত মাছের ২০% কমে যায় ঠিকমত দেখাশোনার ব্যবস্থা না থাকায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপকপূর্ণেন্দু বিশ্বাস এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এই হাসপাতালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এই বইগুলির প্রাপ্তিস্থান ঃ

গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ,
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭, ক্ষুদিরাম বসু সরণী, কলকাতা - ৭০০০৩৭

প্রাণীপালনে মহিলাদের গুরুত্ব ও ভূমিকা

অধ্যাপক শুভাশীষ বিশ্বাস

প্রাণীজ প্রযুক্তি বিভাগ, পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

ভারত হল একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং প্রাণীসম্পদের ভান্ডার, কৃষি ও পশুপালন দুটিই প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। সভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই ভারতে কৃষি ও পশুপালন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের ৬৯ শতাংশ মানুষ এখনও গ্রামে বসবাস করেন। গ্রাম এবং মফঃস্বল এলাকায় কৃষি ও পশুপালন সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার রসদ যোগান দেয়। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ভারতের সমগ্র জিডিপি (GDP) এর ১৩.৯ শতাংশ আসে কৃষি ও পশুপালন-এর কল্যাণে। এই ১৩.৯ শতাংশের প্রায় ৩০ শতাংশ আসে প্রাণীসম্পদ থেকে। তাই পশুপালন ও প্রাণীসম্পদ ভারতীয়দের জীবিকা নির্বাহের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিকোণ।

ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১২১ কোটির কিছু বেশি। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৯.১ কোটি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭.৫৫ শতাংশ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব ১০২৯/বর্গ কিমি। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র আয়তন ৮৮৭৫২ বর্গ কিমি। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী লিঙ্গ অনুপাত ৯৪৭ জন মহিলা প্রতি ১০০০ জন পুরুষ।

ভারতের প্রাণীসম্পদের বিকাশ ও পালন অনেকটাই মহিলাদের উপর নির্ভর। ৭০ শতাংশ কৃষকদের ৮০ শতাংশ মানুষ সাধারণতঃ খাদ্য উৎপাদনকারী ও ৫০ শতাংশ মানুষ খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি ও পশুপালন এই দুইয়ের উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রে পশুপালনে অংশগ্রহণ করার হার শতকরা ৭০ শতাংশের কাছাকাছি। পশুপালনের সমূহ গুরুদায়িত্ব - যেমন পশুখাদ্য সংগ্রহ ও তৈরী, খাওয়ানো, স্বাস্থ্যের দিকে নজর, দুগ্ধারহন অর্থাৎ একটি গোশালার যাবতীয় গুরুদায়িত্ব মহিলারাই নেন। বিভিন্ন প্রাণীজাত দ্রব্য দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদির চাহিদা জনবিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে। এই সেক্টরে মহিলাদের ভূমিকাও বাড়ছে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন তাই আগের থেকে অনেক পরিণত ও শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। প্রাণীপালন হোক বা পশুপালন শিক্ষা হোক সবেতেই এখন মহিলাদের অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য।

ভারত পৃথিবীর মধ্যে দুগ্ধ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। বিশ্বের সমগ্র উৎপাদিত দুগ্ধের ১৬ শতাংশ ভারত উৎপাদন করে, ২০১৩-১৪ অর্থনৈতিক সমীক্ষার সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ভারত ১৩২.৪ মিলিয়ন টন দুগ্ধ উৎপাদন করেছে। জন প্রতি দুগ্ধের চাহিদা বর্তমানে ১৬০ মিলি/প্রতিজন/দিন [ICMR - Indian Council of Medical Research] তথ্য-র যে জায়গায় ভারতের বর্তমান দুগ্ধ উৎপাদন প্রতিজন ৩১০ মিলি/প্রতিজন/দিন যা ভারতের দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রকাশ। প্রাণীসম্পদ বিকাশের সাথে সাথে এটি জীবিকা-দিশারী ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতাকেও প্রতিষ্ঠা প্রদান করে। মানুষের আয় বাড়ায়, রোজগারের রাস্তা তৈরী হয় এবং মানুষের খাদ্যতালিকায় ভিটামিন ও প্রোটিন সমৃদ্ধ উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দিনের পর দিন ভারতের এই উৎপাদনশীলতা বেড়ে চলেছে। শতকরা ৬.৫ শতাংশ হারে দুগ্ধ ও অন্যান্য প্রাণীজ খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়ছে। বর্তমানে পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিকে 'Growing Industry' বলা হয়। লাফিয়ে লাফিয়ে এর চাহিদা বাড়ছে এবং মহিলারা ভালো দাম পাচ্ছেন। গ্রামবাংলায় দারিদ্র্য দূরীকরণে এর অবদান অনস্বীকার্য, বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে Food Security বা খাদ্য নিরাপত্তার একটি অন্যতম স্তম্ভ হল পশুপালন ও প্রাণীজ সম্পদ আহরণ। বিভিন্ন মহিলা স্বনির্ভর গ্রুপের মাধ্যমে MGNREGA প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা কিন্তু নীরবে মানুষের মুখে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার তুলে দিচ্ছেন। তাঁদের নিজেদের পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি সমগ্র ভারতের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছেন। নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি আমরা বিবেচনা করতে পারি এ প্রসঙ্গে - (১) যখন পরিবারে খাদ্যের অভাব দেখা যায় গৃহকর্তা গৃহপালিত পশু বিক্রি করে চাল, ডাল, গম এসব কেনেন। (২) প্রাণীজাত দ্রব্য দুগ্ধ, মাংস, ডিম বিক্রি করে পরিবারের আয় বাড়ান এবং নিজের পরিবারেরও খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। (৩) উক্ত প্রাণী ও তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বিপদসংকুল অবস্থায় বেঁচে থাকার রসদ হিসাবে কাজ করে।

বর্তমানে ভারত দুগ্ধ উৎপাদনে প্রথম, মাংস উৎপাদনে ভারত পঞ্চম স্থান অধিকার করে। গো ও মোষ পালনে ভারত প্রথম, ছাগল পালনে দ্বিতীয়, মেষপালনে তৃতীয়, হাঁস ও মুরগীপালনে চতুর্থ ও উটপালনে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

সর্বশেষ Livestock Census অনুযায়ী ভারত ৭৪.৭৫ বিলিয়ন ডিম, ৪৭.৯ মিলিয়ন কেজি উল, ৫.০৮ মিলিয়ন টন মাংস এবং ৯.৫৮ মিলিয়ন টন মৎস্য উৎপাদন করেছে। যার অধিকাংশ কৃতজ্ঞতাই গ্রামের মহিলাদের প্রাপ্য। বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (দ্বাদশ - ২০১২-২০১৭) থিম 'Sustainable Development' এবং 'More inclusive growth' সার্থক রূপায়ণকারী হল প্রাণীপালন ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ।

মহিলাদের এই অংশগ্রহণ একজায়গা থেকে অন্যজায়গায় ভিন্ন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রাণীসম্পদের রক্ষক বিশেষত মহিলারাও সাংস্কৃতিকভাবে একজায়গা থেকে অন্যজায়গায় জড়িয়ে পড়েন তাদের পশুপালনের প্রকৃতি ও মানসিকতাও ভিন্ন হয়। মহিলারা ছাগল পালন, তাদের দুগ্ধারহণ, স্বাস্থ্যের পরিচর্যা ও ছাগলছানাদের খাবার আমাদের গ্রামবাংলায় বেশি করে থাকেন। এছাড়া, মহিলারা অনেক সময় গোচারণ বা ছাগলচারণেও ব্যস্ত থাকেন, বেশিরভাগ পশুপালন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ গ্রামের মহিলারাই পারিবারিকভাবে করে থাকেন। কোন পশু বিক্রি করা হবে, কত টাকা বিক্রি করা হবে, রোগগ্রস্ত পশুগুলিকে বিক্রি করা হবে কিনা এসব ব্যাপারে মহিলারা পারিবারিকভাবেও কখনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গৃহকর্তার সাথেও আলোচনা করেন।

তবে সামাজিক দিক থেকে এখনও মহিলারা পিছিয়ে, সমাজের সর্বত্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন এখনও দুরঅস্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও কুসংস্কার অনেক জায়গাতে মহিলাদের পর্দার আড়ালেই থেকে যেতে বাধ্য করেছে। এখনও বহু জায়গায় মহিলাদের রোজগারবৃত্তি, বাড়ির বাইরে পশুপালন ও গোচারণহীন ও নীচ চোখে দেখা হয়। পুরুষদের থেকে মহিলারা এখনও কোন কোন জায়গায় সংবিধান স্বীকৃত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়। যেহেতু মহিলারা পারিবারিক কাজ সামলাতে ব্যস্ত থাকেন তাই পারিবারিক খাদ্যাভ্যাসে পুষ্টির নির্ধারণও তাঁদের হাতে, শিশুদের পুষ্টির পরিমাণ কেমন হওয়া প্রয়োজন - মহিলাদের গুরুত্ব সেখানে পুরুষদের থেকেও বেশি। লিঙ্গবৈষম্য দেশের সামাজিক ব্যধি। এই ব্যধির জন্যই সমান পরিশ্রম করেও মহিলারা সমান রোজগার পান না। জুনোটিক রোগ উপেক্ষা করেও মহিলারা সমাজের উন্নতিকল্পের সাথী হচ্ছেন। কিন্তু মহিলারা পশুপালনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সঠিক সম্মান পাচ্ছেন না। আজকের বিশ্বায়নের যুগে এই ঘটনা যেমন লজ্জার তেমনি অপমানের বহুচর্চিত 'গরিবি হঠাও' 'operation flood' এই দুইয়ের বিজয়পতাকা উড্ডীন করে কিন্তু পশুপালন ও প্রাণীসম্পদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর সময় থেকেই দুধ ও মাংস উৎপাদনে প্রভূত জোর দেওয়া হতে থাকে। যাতে মহিলাদের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা শ্যাম বেনেগালের বিখ্যাত ছায়াছবি 'মন্থনে' দেখা গিয়েছে।

গ্রাম ও মফঃস্বল এলাকায় প্রাণীসম্পদ রক্ষার পাশাপাশি সরকার বর্তমানে দুগ্ধজাত ও মাংসজাত 'Value added product' এর উপর জোর দিচ্ছেন, এতে যেমন মানুষের চাহিদা বাড়ছে তেমনি পশুপালনে মানুষের আয় বাড়ছে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে। মহিলারা প্রাণীপালন ও প্রাণীজাত দ্রব্যসমূহ বাজারীকরণের পথ প্রশস্ত করছেন। মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রধান পথ হল - মহিলাদের পশুপালনকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা, এই জীবিকাকে সম্মান করা, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করা এবং মহিলারা যাতে বিক্রীত দ্রব্যসমূহের সঠিক দাম পান অর্থাৎ তাঁদের জীবিকা ও আয়ের উৎসকে পথ দেখানো - এই সমস্ত কাজ সরকার তথা প্রতিটি জনগণের কাছে সহযোগিতা কাম্য। দারিদ্র্য দূরীকরণে মহিলাদের প্রাণীপালনের মাধ্যম ছাড়া আর অন্য কোন জীবিকা এত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে না। প্রাণীপালনে মহিলাদের অংশগ্রহণ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হল -

(১) প্রাণীপালন ও বিকাশ মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নের সোপান, মহিলাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা, সমানাধিকার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করে।

(২) গরু/ছাগল/মোষ কেনাবেচা করে পরিবারে সম্পত্তি বা আপৎকালীন ভিত্তিতে টাকার দরকার পড়লে তা নিশ্চিত করা যায়।

(৩) প্রাণীজাত খাদ্যদ্রব্য যেমন মাছ, মাংস বা ডিমের পাশাপাশি প্রাণীজ কাঁচামাল যেমন চামড়া, উল, হাড় এসব মহিলারা ব্যবহার করেন শৌখিন দ্রব্য তৈরীর জন্য, জ্বালানির জন্য, জামাকাপড় তৈরীর জন্য ইত্যাদি। এইসব দ্রব্য থেকে যে অতিরিক্ত উপজাত দ্রব্য তৈরী হয় তাও আয় উৎসের পরিচায়ক।

(৪) মাছ, মাংস ও ডিমের থেকে সমস্ত উপজাত খাদ্যদ্রব্য তৈরী হয় যেমন মাখন, ঘি, পনির, চিড়া, সুরমি(মাছ থেকে), সসেজ্, নাগেট্স, মিট্ বল ইত্যাদি মহিলাদের আয় বাড়ায়।

(৫) প্রাণীদের মালিক হিসাবে ও তাদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে মহিলাদেরকে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করাও সামাজিক উন্নতিকল্পের সোপান।

(৬) পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদেরও ঐ ভূমির প্রতি নিজেদের অধিকারবোধ জন্মাতে সাহায্য করে।

(৭) পশুপালন ও পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। আয় সুনিশ্চিত করার সাথে পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

(৮) পারিবারিক অর্থনীতি ও সামাজিক অর্থনীতির উপর নিজেদের সচেতনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(৯) কৃষক ও গোপালক বা পালিকাদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত - তারা ইউনিয়ন, ফোরাম বা অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে - নিজেদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়।

(১০) নিত্যনতুন প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে তাঁরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণীপালনে মনোযোগ দেন এর ফলে উৎপাদনশীলতার বিকাশ ঘটে।

(১১) আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী একবার গড়ে উঠলে কুসংস্কার ও সামাজিক ব্যধি ও মুখোশ দূরে চলে যায়। মহিলারা সম্মানের সঙ্গে সমাজে অংশগ্রহণ করেন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

সামগ্রিকভাবে মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়ন মানেই দেশের 'মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক' (Human Development Index) কে ত্বরান্বিত করা ও জনকল্যাণমূলক অর্থনীতিকে এক সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা। এই দুইয়ের লক্ষ্যেই প্রাণীপালনের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেছিলেন - ''I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved'' - অর্থাৎ সমাজ তখনই এগোবে যখন মহিলারা এগোবে আর মহিলারা ক্ষমতার আস্বাদন করবে নির্দ্বিধায়। প্রাণীপালনের মাধ্যমে তা সম্ভব এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। জমি না থাকলে কৃষিকার্য অসম্ভব কিন্তু পশুপালন সম্ভব, নারীর মর্যাদা আমাদের সংবিধান স্বীকৃত বিষয় ও আইনত বৈধ, শুধুমাত্র কাগজ-কলমেই নয় নারীর সম্মানার্থে আমাদের প্রত্যেকে এগিয়ে এসে সমাজের উন্নতিকল্পে অংশগ্রহণ করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি গ্রামবাংলার প্রতিটি মানুষ যদি 'প্রাণীপালনের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন' এই নীতিতে সাবলীল হয় তাহলেই হবে যথার্থ মহিলাদের ক্ষমতায়ন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন মহিলারা স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদায় ভরপুর হবে। রুজভেল্ট বলেছিলেন, ''A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water'' । তাই সমাজের মূলস্রোতে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত জরুরি এবং 'প্রাণীপালন'ই হতে পারে সেই পথের পথিক।

রাইমনির সাফল্যের কাহিনী

সন্দীপ গুপ্ত ঃ রাইমনি সরেন একজন ভূমিহীন দরিদ্র তফশিলি উপজাতিভুক্ত রমণী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যন্ত লোধাশুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নহরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। উনার বাড়ীর সদস্য সংখ্যা চারজন(৪), পুরুষ দুই এবং মহিলা দুই। বাড়ীর উপার্জনক্ষম সদস্য হলেন স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই। মূলত দিন মজুর, সামান্য চাষআবাদ নিজের জমি অথবা পরের জমিতে, জঙ্গলের পরিত্যক্ত কাঠ সংগ্রহ করে জ্বালানী হিসাবে বিক্রয় এবং শালপাতা সংগ্রহ এবং পশুপালন করেন। মাসিক সাকুল্যে ২৫০০ টাকা আয়, তাও সারাবছর নয়, যখন কাজ থাকে তখন, অন্যথায় আয় ও কম, অতিকষ্টে তারা দিন গুজরান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৪ সালে রাষ্ট্রীয় কৃষিবিকাশ অধীনস্থ একটি প্রকল্প (কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে) চালু করে যাতে প্রাণীসম্পদ বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র ও তফ্সিলি উপজাতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়। রাইমনি সরেন এই প্রকল্পের একজন উপভোক্তা। ওনাকে ২০১৫ সালের মার্চে ২টি স্ত্রী ঘঙরু শূকর দেওয়া হয়, তৎসঙ্গ সামান্য শুকর খাবার, কৃমির ঔষধ ও টীকাকরণ করা হয় এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়া হয়। প্রথম এক বছরের মধ্যে দুটি শুকরের ২১টি বাচ্চা বিক্রি করে উনি ৩৭০০০ টাকা আয় করেন এবং এযাবৎ পর্য্যন্ত (দেড় বছর পর্যন্ত) আরও ১৯টি বাচ্চা বিক্রির অবস্থায় আছে, বর্তমানে যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৮০০০ টাকা। প্রকল্পের উপভোক্তা হিসাবে দেড়বছরে ৭৫০০০ টাকা আয়। ওনার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সাথে সাথে অন্যান্য দরিদ্র মহিলাদের শুকর চাষে অনুপ্রাণিত করে এবং আয়ের দিশা দেখিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

গ্রামীণ দুগ্ধ-অর্থনীতি উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা

অধ্যাপক মলয় কুমার সান্যাল
দোহ প্রযুক্তি অনুষদ, পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে গো প্রাণী ও দুগ্ধ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার পর দেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হবার পর ১৯৫১-৫২ সালে মোট দুধের উৎপাদন এবং জন প্রতি দৈনিক দুধের যোগান ছিল যথাক্রমে ১,৭৫,০০০ টন ও ১২৪ গ্রাম, যা ২০১৪-১৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪,৬৩,০০,০০০ টন ও ৩২২ গ্রাম। এই সময়কালে ভারতে দুধের উৎপাদন ৮.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জনসংখ্যার বৃদ্ধির (৩.৪ গুণ) তুলনায় প্রায় আড়াইগুণ বেশী। ১৯৯৮ সাল থেকে আজ অবধি পৃথিবীতে সব থেকে বেশী দুধ আমাদের দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতীয় দুগ্ধ শিল্পের এই অভাবনীয় উন্নতির পিছনে সবথেকে বেশী অবদান রয়েছে অপারেশন ফ্লাড কার্য্যক্রমের, যা ১৯৭০ সালে শুরু হয় এবং তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে ১৯৯৬ সালে শেষ হয়। দুগ্ধশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের প্রথম সারির রাজ্যগুলির তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে, পশ্চিমবঙ্গে দুধের উৎপাদন ছিল ৪৯,৬১,০০০ টন (জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৩.৪ শতাংশ) এবং জন প্রতি দৈনিক দুধের যোগান ছিল ১৫০ গ্রামেরও কম।

গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধশিল্পের উন্নতির পথে বাধা-বিপত্তির কারণসমূহ

আমাদের দেশে দুধ মূলতঃ গ্রামেই উৎপাদিত হয়। দুধ একটি সুষম ও পরিপূর্ণ খাদ্যবস্তু। দুধে পুষ্টিকারক প্রোটিন (দেহসার), ফ্যাট (স্নেহপদার্থ), কার্বোহাইড্রেট (শর্করা), মিনারেল (খনিজ পদার্থ) ও ভিটামিন যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যায়। পুষ্টিগুনে ভরপুর বলে দুধ কিন্তু সহজে পচনশীল। তাই কোনো অবস্থাতেই দুধের অপচয় করা ঠিক নয়। আমাদের দেশে উৎপাদিত দুধের অনেকটা অংশই নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য দায়ী কারণগুলি হোলো -

১) গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাব।
২) দুধ থেকে সহজে দ্রব্য তৈরী করবার বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাব।
৩) দুগ্ধজাত দ্রব্যের যথাযথ বিপনন ব্যবস্থার অভাব।
৪) দুধের উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপননের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

অতিরিক্ত বা অবিক্রীত দুধের ব্যবহার

অতিরিক্ত বা অবিক্রীত দুধকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে শুধু যে অপচয় রোধ করা যাবে তাই নয়, গ্রামের অর্থনীতিও এর ফলে মজবুত হবে। এই ধরনের দুধ থেকে যে সব ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী করে ব্যবসা করা যায়, সেগুলি হোলো - পনীর, ছানা ও ছানা থেকে তৈরী মিষ্ট দ্রব্য, ঘি, দই, খোয়া ও খোয়াজাত মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি। তবে এই ব্যবসা সাফল্যের সঙ্গে করতে হলে নীচে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর নজর দিতে হবে -

১) দুগ্ধচাষীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বা অবিক্রীত দুধ গ্রামে সুবিধামতো কোন এক স্থানে একত্রিত করা।
২) বাজারের চাহিদা মোতাবেক দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলি বিজ্ঞানসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তৈরী করা।
৩) দুগ্ধজাত দ্রব্যের গুনমান যথাসম্ভব বজায় রাখা।
৪) প্রয়োজনীয় বাসনপত্র ও যন্ত্রপাতি জোগাড় করা।
৫) উৎপাদিত দ্রব্যের সঠিকভাবে বাজারীকরণ।
৬) সমস্ত কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, যাতে আর্থিক লাভ ও গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে।

গ্রামীণ দুগ্ধশিল্পে মহিলাদের ভূমিকা

আমাদের দেশে চাষীভাইয়েরা ক্ষেতে কৃষি কাজ যথা শস্য ও শাক-সব্জি উৎপাদনেই মূলতঃ ব্যস্ত থাকেন। গ্রামাঞ্চলে মা-বোনেরাই গো পালন ও ঘরে দুধের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। দুগ্ধশিল্পে উন্নত কিছু রাজ্যে নাকি বাবা-মায়েরা মেয়েদেরকে আগের তুলনায় বেশী বয়সে বিয়ে দিচ্ছেন, যাতে মেয়েরা বেশীদিন ঘরে থেকে দুগ্ধ শিল্প সংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অবশ্য এর প্রভাব যথেষ্ট ইতিবাচক। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপনন করলে গ্রামীণ অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী হবে, তেমনই সমাজে মহিলাদের গুরুত্বও বাড়বে।

দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনে সরকারী সংস্থার সহযোগীতা

বেশীর ভাগ ভারতীয় দুগ্ধজাত দ্রব্যই সহজে গ্রামে উৎপাদন করা যায়। এজন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিও আমাদের রাজ্যে উপলব্ধ আছে। অনেক সংস্থাই এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সরকারী সংস্থা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং সেগুলির বিপননের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকে। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণমানও সরকারী ল্যাবরেটরিতে যাচাই করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা তৈরী নমুনা প্রকল্প অনুযায়ী দৈনিক ১০০ লিটার দুধ থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী ও বিক্রী করে প্রতিমাসে নিম্নলিখিত হারে লাভ করা যেতে পারে -

দুগ্ধজাত দ্রব্য	মাসিক লাভের অঙ্ক (টাকা)
পনীর	৩৫,০০০
খোয়া	৩০,০০০
ছানা	২৮,০০০
দই	৪৫,০০০

উপসংহার

অতিরিক্ত বা অবিক্রীত দুধ থেকে গ্রামাঞ্চলে কিছু বিশেষ ধরনের দুগ্ধজাত দ্রব্য যথা পনীর, খোয়া ও খোয়াজাত মিষ্টদ্রব্য, ঘি, দই, ছানা ও ছানাজাত মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তৈরী করা সম্ভব। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, তেমনই অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে কমদামে পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু দেওয়া যাবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত কাজই মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে করতে পারবেন, যা গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ জীবনকে উন্নততর করবে। এ ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত ও রাজ্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের অধীনে থাকা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নারী ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভরতায় মৎস্য চাষ

ডঃ সুপ্রতিম চৌধুরি
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি বিভাগ, পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

মানব সভ্যতার উন্নয়নের স্বার্থে নারী পুরুষের সমঅধিকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজ নারীদের হাতে তুলে দিয়েছে মাতৃত্ব ও পারিবারিক মেলবন্ধনের গুরুদায়িত্ব। ফলস্বরূপ তারা বহুমুখী প্রসার ও প্রগতির থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। তাই নারী অগ্রগতির মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে স্বাধীন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রযুক্তিগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক অধিকার ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা।

ক্রমবর্ধমান ভারতীয় অর্থনীতিতে গড় জাতীয় উৎপাদনের ১৭.৯ শতাংশ আসে কৃষি ও সহযোগী অংশ থেকে। তারই মধ্যে মৎস্য চাষ থেকে আসে ০.৯২ শতাংশ। তাই ভারতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য চাষে প্রথম সারিতে রয়েছে। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামল বাংলায় মৎস্য চাষ এর মাধ্যমে নারীদের স্বনির্ভরতা ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের দিকটি প্রসারিত।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরীর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি এখন অনেকবেশি অগ্রগতি পেয়েছে। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে। তাতে কৃষিকাজ, পশুপালনের পাশাপাশি মৎস্যচাষের গোষ্ঠীও তৈরী হয়েছে। মৎস্য চাষের মাধ্যমে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি স্বনির্ভরতার পথে এগোতে পারে। মৎস্য চাষের মধ্যে যেসব চাষ পদ্ধতিগুলির সাহায্য নিতে পারে সেগুলি হল - (১) ডিমপোনার চাষ, (২) ধানীপোনার চাষ, (৩) পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের চাষ, (৪) মাগুর (দেশী) মাছের চাষ, (৫) কই মাছের চাষ, (৬) রঙিন মাছের চাষ।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলি সদস্যদের নিজস্ব অথবা লীজ নিয়েও পুকুরে চাষ করতে পারে। ডিমপোনার চাষের ক্ষেত্রে ছোট পুকুরে (৫ কাঠা) ১৫ দিনের চাষ প্রক্রিয়ায় ধানীপোনায় পরিণত করে বাজারজাত করতে পারবে। ধানীপোনা চাষের ক্ষেত্রে ৫-৮ কাঠা মাপের পুকুরে ৭০-৯০ দিনের চাষ প্রক্রিয়ায় চারাপোনা তৈরী করে বাজারজাত করা যাবে। এছাড়াও গোষ্ঠীগুলি বড়পুকুরে (১-৫ বিঘা পর্যন্ত) কার্প জাতীয় মাছ (কাতলা, সিলভার কার্প, রুই, গ্রাসকার্প, মৃগেল, বাটা) চারাপোনা অবস্থায় মজুত করে ছয় থেকে সাত মাস পর ৭০০-৮০০ গ্রাম মাপের মাছ উৎপাদন করে বাজার জাত করতে পারবে।

বর্তমানে দেশি মাগুর ও কই মাছের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জোগান কম। তাই এদের বাজার মূল্য খুবই ভালো। দেশি মাগুর ও কই মাছ ছোট এঁদো পুকুরে (৩-৫ কাঠা) অথবা সিমেন্টের চৌবাচ্চায় চার থেকে পাঁচ মাসের চাষ প্রক্রিয়ায় বাজার জাত সাইজ পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে আমাদের এই সমস্ত চাষের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলিকে অবশ্যই ব্লকের মৎস্য দপ্তর, জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র নতুবা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে এগোনো দরকার। রাজ্যে রঙিন মাছের বাজার খুব ভালো। মূলতঃ কলকাতার হাতিবাগানের গ্যালিফ স্ট্রীট ও হাওড়া মার্কেট হল এর পাইকারী বাজারের ঠিকানা।

বিভিন্নভাবে রঙিন মাছের চাষ করা যেতে পারে। সেসব মাছ সহজেই চাষ করা মানে সেগুলি হল গোল্ডফিস, মলি, গাপ্পি, সোর্ট টেল, গই কার্প, রোজিবার্ব, টেট্রা, গোরামি ইত্যাদি।

বিভিন্নভাবে রঙিন মাছের চাষ করা যেতে পারে -

১) ছোট পুকুরে চাষ (৩-৪ কাঠা)
২) সিমেন্টের চৌবাচ্চায় চাষ
৩) গোলাকার চৌবাচ্চায় চাষ

এইসব চাষের ক্ষেত্রে পাইকারী বাজার থেকে ছোট মাছের চারা এনে ছাড়তে হবে। ৩-৪ মাসের চাষে মোটামুটি বাজারজাত করার জন্য সঠিক দাম পাওয়া যায়। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এ্যাকোরিয়াম তৈরী করে সেগুলি বিক্রি করে আয় করতে পারেন। এ্যাকোরিয়ামের বিভিন্ন সাজানোর জিনিস তৈরী করে আয় করতে পারে।

মাছ চাষের পাশাপাশি স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি মৎস্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং মৎস্যজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ করে তা বাজারজাত করতে পারে। এতে লাভের পরিমাণ ভালো হয়। মাছ চাষের জন্য মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী রাজ্য মৎস্য দপ্তরের স্কীম, MPEDA থেকে স্কীম, NFDB থেকে স্কীম এবং ATMA এর বিভিন্ন স্কীম থেকে সহায়তা পেতে পারেন।

প্রাণী পুষ্টির অন্যতম উপাদান

গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ,
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়,
৩৭, ক্ষুদিরাম বসু সরণী,
কলকাতা - ৭০০০৩৭

দেশী মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী প্রমাণ করল রাজ্যের গবেষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'হরিণঘাটা ব্ল্যাক'নামক পশ্চিমবঙ্গের একটি দেশী প্রজাতির মুরগি রোগ তৈরীতে পটু ই. কোলাই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ক্ষমতা প্রদর্শন করল। বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবদ বলে আসছেন যে দেশী প্রজাতির মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। কিন্তু হাতে কলমে প্রমাণের অভাব ছিল এতদিন। সাম্প্রতিক একটি গবেষণার ফল সেই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করল বলে মনে করছেন ওয়াকিবহলমহল।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বেলগাছিয়া, কলকাতার একদল গবেষক ক্ষতিকর ই.কোলাই ব্যাক্টেরিয়ার ওপর একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। মুরগির নানা প্রজাতির ওপর এই ধরণের জীবাণুর প্রভাব দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। ব্রয়লার ও ডিম উৎপাদনকারী প্রজাতি 'আর আই আর'-এর সঙ্গে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন হরিণঘাটা ব্ল্যাক নামক দেশী প্রজাতির মুরগিকে। এই গবেষণা প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কেন্দ্রীয় সরকারের জৈব প্রযুক্তি বিভাগ।

ই.কোলাই একটি মানুষ তথা পশু-পাখির অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণু। এই জীবাণুর নানা প্রজাতির মধ্যে কিছু ক্ষতিকর প্রজাতি বর্তমান। এই রোগসৃষ্টিকারী প্রজাতিগুলি মুরগিতে সাধারণ ডায়ারিয়া থেকে শুরু করে 'হাজারে ডিজিজ' নামক প্রাণঘাতী মড়ক সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের দেহে এই ক্ষতিকর ই.কোলাই অন্ত্র, বৃক্ক ও মূত্রনালীর সংক্রমণ ঘটায়। মহিলাদের মূত্রনালীর ই.কোলাই সংক্রমণতো হামেশাই চোখে পড়ে।

হরিণঘাটা ব্ল্যাক মুরগি মূলতঃ উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলার কিছু অঞ্চলে পাওয়া যায়। কালো রং-এর এই প্রজাতির মুরগি নদীয়ার হরিণঘাটা অঞ্চলে বেশী পাওয়া যাওয়ায় বিজ্ঞানীমহলে এটি হরিণঘাটা ব্ল্যাক নামে পরিচিত।

এই গবেষণা প্রকল্পে, ব্রয়লার, আর আই আর ও হরিণঘাটা ব্ল্যাক-এই তিনটি প্রজাতির মুরগিতে আলাদাভাবে ক্ষতিকর ই.কোলাই প্রবেশ করিয়ে রোগসৃষ্টির চেষ্টা করা হয় এবং এদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় হরিণঘাটা ব্ল্যাকের সেলুলার ইমিউন রেস্পন্স ও অ্যান্টি ই.কোলাই অ্যান্টিবডির পরিমাণ অন্য দুটি প্রজাতির তুলনায় গুরুত্বপূর্ণভাবে বেশী। দ্বিতীয়তঃ ডায়ারিয়া, পালক পড়ে যাওয়ার মত লক্ষণগুলি অন্য দুটি প্রজাতির মুরগিতে দেখা গেলেও হরিণঘাটা ব্ল্যাকে অনুরূপ কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

এই গবেষণার ফলাফল 'জার্নাল অফ্ এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি এন্ড এগ্রিকালচারাল সায়েন্স'-এ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বলে জানালেন ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার।

দেশী মুরগির পালন ও ব্যবসার প্রচারে এই গবেষণা যে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্ধারণে প্রাণী পালনের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা সম্পন্ন হল IVRI এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় (কলকাতা)

বাবুলাল টুডু ঃ গত ১৬ই আগষ্ট ২০১৬ (মঙ্গলবার) IVRI এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল ''আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবিকা নিরাপত্তার স্বার্থে পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রাণী পালনের ভূমিকা'' শীর্ষক একটি কর্মশালা।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন তথা প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক বি. বি. মল্লিক মহাশয় সহ IVRI এর অধিকর্তা তথা উপাচার্য ডঃ আর. কে. সিং মহাশয়।

কর্মশালায় আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মল্লিক বলেন 'আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেরই জমির পরিমাণ কম থাকায় তাদের চাষের অভ্যাস নেই বললেই চলে। তাই প্রাণী ও পক্ষী পালনই তাদের দৈনন্দিন অভ্যাস ও সংস্কৃতি। তিনি আরো বলেন, গরীব মানুষদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে প্রাণী পালনের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং এই উদ্যোগকে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বলে মনে করেন। IVRI এর অধিকর্তা তথা উপাচার্য ডাঃ সিং গ্রাম্য সচেতনতার উপর জোর দেওয়ার কথা বিশদে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস উক্ত কর্মশালার গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্যোগক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে উপদেশ দেন যে, আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে এই ধরনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ এবং বাজারজাতকরণ করার প্রক্রিয়াকে আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে তাহলেই এই ধরনের অনুষ্ঠানের সুফল পাওয়া যাবে বা সফলতা আসবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রাণীসম্পদ ও প্রাণী চিকিৎসা অধিকরণের অধিকর্তা, পঃ বঃ সরকার, ডাঃ এ. জি. বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি প্রকল্পে প্রজাতিগত উন্নয়নের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সারাদেশের বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করে এই কর্মশালাকে সমৃদ্ধ করেন।

বিকল্প সবুজ পশু খাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষের ভূমিকা

বিপ্লব দাস ঃ জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র উন্নত পদ্ধতিতে প্রাণীপালনের মাধ্যমে জেলার চাষীদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি প্রকল্পে নিরলস কাজ করে চলেছে। বিকল্প সবুজ পশু খাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ করা এবং সেই অ্যাজোলা গবাদি পশু এবং মুরগীকে খাইয়ে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এই উন্নত প্রযুক্তিটি জেলার চাষীদের মধ্যে প্রচলিত করে তোলা জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের একটি সফল প্রচেষ্টা।

জেলার বিভিন্ন ব্লক যেমন - ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা এবং মালবাজার থেকে বিভিন্ন ফার্মার্স ক্লাব এবং তার সদস্য চাষীরা এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের থেকে অ্যাজোলা চাষের উপরে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে ময়নাগুড়ির দিশা ফার্মার্স ক্লাব (রথেরহাট, চূড়াভান্ডার গ্রাম), বাগজান প্রগতিশীল ফার্মার্স ক্লাব (বাগজান, ময়নাগুড়ি), কৃষকবন্ধু ফার্মার্স ক্লাব (ব্যাংকান্দি, ময়নাগুড়ি), ফিডার ফার্মার্স ক্লাব (বোউলবাড়ি, ময়নাগুড়ি), অন্নপূর্ণা ফার্মার্স ক্লাব (ধূপগুড়ি) এর চাষীরা তাদের নিজেদের অঞ্চলে ২০টি অ্যাজোলা প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরী করে চাষ করছেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন গ্রামের আরও ১৩ জন চাষী নিজেদের খামারে এই অ্যাজোলা চাষ করছেন। জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এই সকল ফার্মার্স ক্লাব ও চাষীদের নিজেদের প্রদর্শনী একক থেকে অ্যাজোলার বীজ এবং পলিথিন শীট প্রদান করেছে।

এই সকল প্রদর্শনী ক্ষেত্র দেখে ও তার সম্পর্কে অবহিত হয়ে বর্তমানে আরও চাষীরা অ্যাজোলা চাষে আগ্রহী হয়েছেন এবং প্রশিক্ষণের আবেদন করেছেন।

প্রাণী স্বাস্থ্য সচেতনতা ও টীকাকরণ শিবির

সৌমিত্র পণ্ডিত ঃ গত ৪ঠা এপ্রিল, ২০১৬ সালে সুন্দরবন এলাকার নামখানা ব্লকের চন্দনপিড়ি গ্রামে - ''পঃবঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে''র উদ্যোগে ও স্থানীয় বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় প্রাণী স্বাস্থ্য সচেতনতা ও টীকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মূলত গরুর- FMD, ছাগলের -PPR ও মুরগির - R_2B টীকাপ্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে ''ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন'' ও বিভিন্ন ''প্রাণীর রোগ ও তার প্রতিকার'' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় - যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, এলাকার প্রাণীবন্ধু, প্রাণীমিত্রা ও খামারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের DSW অধ্যাপক আশীষ কুমার সামন্ত; NSS - এর পোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ডাঃ শুভাশীষ বটব্যাল, অধ্যক্ষ - অধ্যাপক প্রণব কুমার সেনাপতি, ডাঃ শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ পার্থ দাস প্রমূখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সকলেই আগামী দিনে প্রাণীপালনের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন এবং আরো বেশী টীকাকরণ ও স্বাস্থ্য সচেতনা শিবিরের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের উন্নতিসাধনের কথা বলেন।

'টি সেল ভ্যাকসিন'

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মানুষের গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বে টিকা আবিষ্কারের সূচনা হয়। সালটা ১৭৯৮। ব্রিটিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার সে সময় গরুর গুটি বসন্তের নির্যাস ব্যবহার করেছিলেন মানুষের বসন্তরোগ প্রতিরোধে। সেই গবেষণার সাফল্যকে সম্মান জানাতে একশো বছর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এহেন প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বোঝাতে ভ্যাকসিন বা টিকা শব্দটি ব্যবহার করেন বিশিষ্ট ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। ভ্যাকসিন শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'ভাক্কা' থেকে। আসলে ল্যাটিন পরিভাষায় 'ভাক্কা' শব্দটির অর্থ গরু। গরুর গুটিবসন্তের নির্যাস প্রথম টিকাতে ব্যবহৃত হওয়ায় বিজ্ঞানী পাস্তুর ভাক্কা শব্দটি সামনে আনেন। পরবর্তী একশো বছরে সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। সুখের কথা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ৭০ দশকের মাঝামাঝি মানুষের গুটি বসন্ত পৃথিবী থেকে নির্মূল করা গেছে। কিন্তু আফশোসের কথা, এখনও প্রাণী ও পাখির গুটি বসন্ত বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও এমনকি উন্নত দেশগুলিতেও।

আমাদের রাজ্যের ৮০শতাংশ ডিম আসে চরে খাওয়া বা মুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে পালিত মুরগি থেকে। আর এই ধরনের পালিত মুরগির একটি ভয়ানক রোগ হল 'ফাউল পক্স' বা গুটি বসন্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগের প্রচলিত টিকা কার্যকর হয় না। তাই মুরগির গুটি বসন্তের টিকার মান আরও উন্নত কীভাবে করা যায়, তার প্রয়াস চলছিল বহুদিন যাবৎ। সম্প্রতি মুরগির গুটি বসন্ত প্রতিরোধে উন্নতমানের টিকা তৈরির দিশা দেখালেন বাংলার একদল গবেষক। বেলগাছিয়ায় অবস্থিত রাজ্যের প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের ছয় গবেষক এই কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের করা গবেষণার ফলাফল ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'অ্যাভিয়ান ডিজিজ' নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত জার্নালে। এঁরা টি-লিম্ফোসাইট ভিত্তিক টিকা তৈরির অ্যান্টিজেন শনাক্ত করতে পেরেছেন, যা রীতিমত একটি কঠিন কাজ।

পাট পচানো পুকুরে মাছ চাষ

অনিন্দ্য নায়ক ঃ পাট পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় খুব ভালো পাট হয়। এই জেলার চাষীরা পাট পচানোর জন্য বদ্ধ ও উন্মুক্ত বা ডোবা ব্যবহার করে থাকেন অনেক সময়ই পাট পচানোর পর এইসব জলা, ডোবাগুলি পতিত পড়ে থাকে এবং মশার বংশবৃদ্ধি করে রোগ ছড়ায়। এই জলা বা ডোবাগুলির সঠিক যত্ন নিলে মাছ চাষ করে যথেষ্ট লাভবান হওয়া সম্ভব, যেমন পাশাপাশি মশার বংশবৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই ধরনের পুকুরে জৈব পদার্থের পরিমান ভালো মাত্রায় থাকে বলে পুকুরে যথেষ্ট খাদ্যকণা তৈরী হয়ে থাকে। ফলে মাছের বৃদ্ধি অল্প সময়েই বেশ ভালো হয়। সাধারণত দেখা যায় পাট পচানোর পর কমপক্ষে ৩ মাস কম বেশি এক কোমর (৩-৪ ফুট) জল থাকে। যেহেতু পাট পচানোর পর জলে অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কমে যায় ও জলের ক্ষারত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পায় তাই মাছ চাষের জন্য এইসব পুকুরে বিশেষ পরিচর্যা প্রয়োজন। তাই প্রথম অবস্থায় ভাসমান আবর্জনা ও আগাছা পরিষ্কার করে ফেলে কাঠা প্রতি ১-১.৫ কেজি চুন প্রয়োগ করে নিতে হবে। দিন পনেরো পর যদি পুকুরের জল মাছ ছাড়ার উপযুক্ত না হয় তাহলে আরও ১৫দিন পর ১ কেজি কাঠা প্রতি চুন দিতে হবে। এবং পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট কাঠাপ্রতি ১৫০ গ্রাম হিসাবে ছড়ানো হবে। যদি পুকুরে খুব শ্যাওলা হয় তবে কাঠাপ্রতি ২-৫ গ্রাম তুঁতে ৪-৫ ইঞ্চি জলের তলা পুঁটলিতে করে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়। এরপরই মাছের চারা পুকুরে ছাড়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মাছের চারা ৩-৪ ইঞ্চি সাইজের হওয়া প্রয়োজন। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে কাতলা, রুই, রুপালী রুই, ঘেঁসো রুই, তেলাপিয়া, আমেরিকান রুই চাষ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিঘা প্রতি পোনা মাছ ছাড়া যাবে কাতলা ১৫০টি, রুই ১৫০টি, রুপালী রুই ৩০০টি ঘেঁসো রুই ২০০টি, আমেরিকান রুই ২০০টি। এছাড়া জিওল মাছ যেমন শিঙি, মাগুর ইত্যাদি এককভাবে বা মিশ্রভাবে চাষ করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে মিশ্র চাষে শিঙি ও মাগুর বিঘা প্রতি ২০০টি করে ছাড়া যেতে পারে। শুধুমাত্র তিলাপিয়া এককভাবে বিঘাপ্রতি ২৬০০টি করে ছেড়ে চাষ করা যেতে পারে। এছাড়া এককভাবে পাঙ্গাস বিঘাপ্রতি ২৬০০টি করে ছেড়ে চাষ করা যেতে পারে।

রাজ্য সরকারের নির্ধারিত গবাদি প্রাণীর প্রজনন নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্যে গবাদি প্রাণীর উপযুক্ত প্রজনন নীতি নির্ধারণ করেছে। রাজ্যে অস্বীকৃত গরুকে দেশী উন্নত প্রজাতির গরু শাহিওয়াল ও গির প্রজাতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত বা গ্রেডিং আপ করা হবে। রাজ্যের দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও হুগলী জেলাতে শাহিওয়াল প্রজাতির গরুর বীজ ব্যবহার করা হবে দেশীয় গরুর গ্রেডিং আপ করাতে। অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হাওড়া জেলাতে গির প্রজাতির গরুর বীজ ব্যবহার করা হবে কৃত্রিম প্রজননের জন্য। রাজ্য সরকার উক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আরও জানিয়েছে যে এই প্রজাতি উন্নয়নের পদ্ধতি অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া নির্ভরশীল এবং শতকরা ৮০ শতাংশ অস্বীকৃত গরুকে এই নীতির আওতায় আনা হবে। বেশী দুধ উৎপাদনকারী বিদেশী প্রজাতির গরু মূলতঃ জার্সি, কোন কোন ক্ষেত্রে 'হলষ্টিয়ান ফ্রিসিয়ান' ষাঁড়ের শুক্রাণু দিয়ে বাকী ২০ শতাংশ অস্বীকৃত দেশীয় গরুকে সংকরায়ণ করা হবে কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনভাবেই বিদেশী প্রজাতির গুণ ৫০ শতাংশের বেশী না হয়। পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি, বিভিন্ন N.G.O বা প্রগতিশীল কৃষক যাদের সবুজ গোখাদ্য এর প্রাযুজ্য আছে তাদের ক্ষেত্রেই এই সংকরায়ণের ব্যবহার করা হবে। হলস্টিয়ান ফ্রিসিয়ান প্রজাতির শুক্রাণু দিয়ে সংকরায়ণ করার সময় প্রাণী পালকের চাহিদার কথা মাথায় রাখতে হবে। দেশীয় প্রজাতির (শাহিওয়াল ও গির) ষাঁড়ের শুক্রাণু দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অস্বীকৃত দেশী গরুর উত্তরসুরীকে উন্নত (প্রায় ১০০ শতাংশ) প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব। এর ফলে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন অনেক গুণ বাড়বে বলে প্রাণী বিজ্ঞানীদের ধারনা। বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকার নিয়মিতভাবে কৃত্রিম প্রজননে যুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার আয়োজন করেন।

ঃ পরবর্ত্তী সংখ্যায় থাকছেঃ

''পাঠকের কলম''— লেখা পাঠান

প্রশ্ন পাঠান — ''জানতে চাই কলমে''

ঘরের লক্ষ্মী ছাগল

কৌশিক পাল ঃ ''আমি খুব খুশী, এ তো আমার ঘরের লক্ষ্মী - আমার ব্যাঙ্ক'' - এ কথা আমার আপনার মতোই সাধারণ চাষী-বাসী ঘরের এক মহিলা মঞ্জু বিশ্বাস - এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়া-১ নং ব্লকের কুমড়া কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাকালতলা গ্রামের এই মহিলা বাড়ির অন্যান্য কাজের পাশাপাশি কিছু দেশী ছাগল পোষেন। তাদের মধ্যেই একটি এই চমৎকারী ছাগল যে কিনা প্রতিবার পাঁচটি করে সুস্থ বাচ্চা প্রসব করে। প্রতিবার দুই বা তার বেশী বাচ্চা দেওয়া বাংলার কালো ছাগলের একটি বিশেষ গুণ, কিন্তু প্রত্যেকবার পাঁচটি করে বাচ্চা প্রসব করা সত্যিই বিরল ঘটনা। তিন বছর আগে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সূত্রে এই মহিলার যোগাযোগ হয় উত্তর ২৪ পরগণা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাথে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত অন্যান্য ছাগলের সাথে সাথে এই ছাগলটির বিশেষ যত্ন, খাওয়া-দাওয়া, পরিচর্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও পরামর্শ তিনি নিয়মিত পেয়ে এসেছেন এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। বর্তমানে ছাগলটি গাভীন এবং বাচ্চা দেওয়ার মুখে। ''চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে এবার ছ-টা হবে, দেখা যাক'' - হাসিমুখে বললেন মঞ্জু দেবী। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো ওনার স্বামী সুশান্ত বিশ্বাস-এর। হবে না ই বা কেন ? সত্যি সত্যিই যে এ ছাগল ঘরের লক্ষ্মী।

মাটি ছাড়া গোখাদ্য চাষের প্রকল্পের উদ্বোধন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃমাটি ছাড়া সবুজ গোখাদ্য চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ''হাইড্রোফোনিক্স'' ব্যবস্থা রাজ্যে প্রথম চালু হল পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসে। এই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রী স্বপন দেবনাথ মহাশয়, গত ২৮শে জুলাই, ২০১৬ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা শ্রীমতি নীলিমা নাগ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রী রাজেশ সিন্‌হা, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী দেবপ্রসাদ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। সবুজ গোখাদ্য চাষের জমির অপ্রতুলতার কারণে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রাণী পালকদের কাছে আকর্ষনীয় হবে বলে সকলেই আশা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থার সার্থকতা প্রমাণিত হলে এই ব্যবস্থা সাধারণ প্রাণীপালকদের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য অধ্যাপক বিশ্বাস জানান। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মোহনপুর ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের সদর্থক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সার্থকতা পায়।

ছাগল পালনে জ্যোৎস্নার সাফল্য

মানিকচন্দ্র পাখিরা ঃ জ্যোৎস্না সবর একজন বি.পি.এল তালিকাভুক্ত ভূমিহীন রমণী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকের অন্তর্গত পাটাশিমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লোহামেলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তফসিলি উপজাতিভুক্ত এবং দিনমজুর খেটে জীবিকা নির্বাহ ও সংসার চালান। এই রমণী ও তাঁর স্বামী শিক্ষার আঙিনায় পৌঁছতে পারেন নি। অত্যন্ত কষ্টে তারা দিন যাপন করতেন। তাদের মাসিক আয় সর্বসাকুল্যে ২৫০০ টাকা।

২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ ''ন্যাশনাল এগ্রিকালচার ইনোভেশন প্রোজেক্ট (কম্পোনেন্ট-৩) সাসটেনেবল ফার্মিং সিস্টেম টু ইনহেন্স এবং ইনসিওর লাইভলিহুড সিকিউরিটি অফ পুয়োর ইন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিমমেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট অফ্ পশ্চিমবঙ্গ'' প্রকল্প অধিগ্রহণ করে যাতে দরিদ্র ও তফসিলি উপজাতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো যায়। প্রকল্পটি পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাতে চলতে থাকে। এরই অঙ্গ হিসাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম ব্লকের পাটাশিমূল গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্পটি চালু হয় আগষ্ট মাসে। জ্যোৎস্না সবর হলেন একজন উপভোক্তা। তিনটি ছেলে ও স্বামী নিয়ে ওনার সংসার। প্রকল্পের শুরুতে ওনাকে পাঁচটি স্ত্রী বাংলার দেশী ছাগল দেওয়া হয়, তৎসহ সামান্য পরিমাণ দানা খাবার এবং সময়মত প্রাণী চিকিৎসা ও টিকাকরণ করা হয় দেড় বছর পর উনি বিক্রি করেন এবং লাভ করেন ১৪০০০ (চোদ্দ হাজার টাকা)। দিনমজুর খাটার সাথে সাথে প্রাণীপালন করে অতিরিক্ত আয় ওনার জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য বিশেষ সহায়ক হয়।

ভারত বার্ড ফ্লু মুক্ত ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানালো যে আমাদের দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ এই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে বার্ড ফ্লু (H_5N_1) মুক্ত। ভারত সরকারের এই ঘোষণায় দেশের মুরগি পালকদের মধ্যে নতুন করে মুরগি পালনে আরও উৎসাহিত করবে বলে ধারণা করেন রাজ্যের প্রাণীবিশারদরা।

অধ্যাপক অরুণাশিস্ গোস্বামী, অধিকর্তা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭, ক্ষুদিরাম বসু সরণী, কলকাতা - ৭০০০৩৭ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত,
সম্পাদক ঃ ডঃ অরুণাশিস্ গোস্বামী। মুদ্রণে ঃ মেসার্স এস. দত্ত, ৫৮/১, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৭, চলভাষ ঃ ৯৮৩০২৫৬৪২২